হ্যারি পোটার ও দুই বঙ্গ কিশোরী

ফরিদ আহমেদ

এই লেখাটি বেশ কয়েকমাস আগে হ্যারি পোটার ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পরপরই লিখেছিলাম। যায় যায় দিনে প্রকাশিত হওয়ারও কথা ছিল। আলসেমি করে লেখাটি আদৌ সেখানে ছাপা হয়েছিল কিনা তার আর খোঁজখবর নেওয়া হয়নি কখনোই। কুঁড়েমির কারণে নতুন কিছুও লিখিনি বেশ কয়েকদিন, তাই পুরনো এই লেখাটিই পাঠকদেরকে জোর করে পড়ানোর চেষ্টা করছি। আমার এই জোর জবরদস্তিতে আশা করি পাঠকরা ধৈর্য্যহারা হবেন না।

স্কুল থেকে ফিরে লিভিং রুমের সোফার উপর ব্যাগটা ছুড়ে দিয়েই আমার বারো বছরের ছেলে অর্কর তাৎক্ষনিক তাড়া, "আব্বু, রেডি হও। হ্যারি পোটার দেখতে যাবো"। "তাড়াহুড়োর কি আছে? আগামীকাল শনিবার। ছুটির দিন। ঠান্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে"। আমি জবাব দেই। আমার কথা শুনে মনে হলো যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। দুনিয়ার সমস্ত আবেগ উথলে উঠলো তার কচি কণ্ঠে। "তুমি জানো এই মুভিটা দেখার জন্য আমি সেই কবে থেকে ওয়েট করে আছি। তোমাকে লং টাইম এগো বলে রেখেছি টিকেট কিনে রাখার জন্য। আমার সব ফ্রেন্ডরা আজকেই দেখতে যাচ্ছে। তুমি প্রমিজ করেছিলে। আর এখন বলছো স্যাটারডেতে যাওয়ার জন্য"। বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে বাংলা এবং ইংরেজী সংমিশ্রিত নিজস্ব বাংরেজীতে তার উত্তর। দুঃখ- অভিমান আর বহু কাংখিত কোন কিছু না পাবার বেদনায় ছেলের চোখ তখন ছলছল। ভুলে যাওয়ার গ্লানি ও অপরাধবোধে (ভুলে যাওয়াটা অবশ্য আমার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য) আমিও তখন ম্রিয়মান। আসলেই কয়েকদিন আগেই সে আমাকে বলে রেখেছিল অগ্রীম টিকেট

করে রাখার জন্য। আড়চোখে দেখতে পাই কিচেনে রান্নায় ব্যস্ত আমার বাল্য প্রেমের সংগিনী ছেলের মা বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যার অর্থ খুবই সহজবোধ্য। জীবনে সবকিছুই শুধু হালকাভাবে নিচেছা, এখন বোঝ ঠেলা। আমি তার অগ্নি দৃষ্টি উপেক্ষা করে যাই, না দেখার ভান করি। ছেলের কষ্ট লাঘব করা আর তার কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষায় তখনই হ্যারি পোটার দেখতে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে যাই। তাকে বলি সিলভার সিটির কোন শোতে সিট খালি আছে তা ইন্টারনেটে চেক করার জন্য । ছেলে সোল্লাসে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায় তার রুমে। কিছুক্ষনের মধ্যেই তার হতদমিত হতাশ কণ্ঠ শুনতে পাই, ”আব্বু, এভরি সিংগল টিকেট ইজ সোল্ড আউট ইন সিলভারসিটি”। আমার মাথায় তখন বাজ পড়ার দশা। এখন উপায়। ”ভাল করে দেখ”, আমি চিৎকার করি। কিছুক্ষনের মধ্যেই ছেলের উল্লসিত চিৎকার ভেসে আসে, ”ওনলি টেন থার্টির শোতে সিট এভেইলেবল আছে”। ছেলের চিৎকারে আমিও যেন প্রাণ ফিরে পাই। পড়িমড়ি সিড়ি ভেঙ্গে ছুটে যাই কম্প্লিউটারের সামনে। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে সাড়ে দশটার শোর তিনটা টিকেট কেটে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ছেলের মুখে তখন অনাবিল মিষ্টি মধুর হাসি। খুশিতে জড়িয়ে ধরে আমাকে। তার পরিতৃপ্ত হাসি দেখে আমারও বুক জুড়িয়ে যায়।

আমার বাসা থেকে সিলভার সিটি মাত্র দশ মিনিটের ড্রাইভ। রাত দশটার সময় তিন সদস্য বিশিষ্ট আমাদের এই পরিবারটি রওনা দেই সিলভার সিটির উদ্দেশ্যে। বক্স অফিস থেকে টিকেট সংগ্রহ আর পপকর্নের প্যাকেট কিনে সাত নম্বর হলে ঢুকেতো আমাদেও চক্ষু চড়কগাছ। সমস্ত হল টিনএজার ছেলে মেয়ে দিয়ে ভর্তি। তাদের চিৎকার আর নাচানাচিতে নরক গুলজার অবস্থা। শুধুমাত্র সামনের তিনটা লাইন কোনরকমে খালি আছে। ভয়াবহ হইচইয়ে কানে তালা লেগে যাওয়ার যোগাড়। টিনএজাররা যে কিভাবে এতো হট্টগোল করতে পারে তা নিয়ে আসলেই গভীর গবেষনার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে এ সমস্ত দেশে মেয়েরা যেন আরো এককাঠি সরেস। ছেলেদের গলা ছাপিয়ে তাদের তীক্ষ্ন চিৎকারই কানে আসছে বেশী ।

এখানকার সিনেমা হলের টিকেটে কোন সিট নাম্বার থাকে না। হলে ঢুকে যার যেখানে খুশি বসতে পারে। সারা হল চোখ বুলিয়েও পিছনের দিকে কোন জায়গা না দেখে অগত্যা পর্দার সামনের তৃতীয় সারিতেই বসতে হলো। সিটের অবস্থান পর্দার চেয়েও নিচে। ঘাড় বাঁকা করে উর্ধ্বমুখী না হয়ে সম্পুর্ন পর্দা চোখের ফ্রেমে আনা সম্ভব নয়। তার উপর আবার সুবিশাল পর্দা, ডানে বায়ে মা্থা না ঘুরিয়ে পর্দার দুইপাশের অংশ দেখাও সম্ভব নয়। একেবারে বাংলাদেশের সিনেমা হলের থার্ডক্লাসে ছবি দেখার মতো। এ ধরনের এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল চট্টগ্রামের বনানী কম্প্লেক্সে পদ্মা নদীর মাঝি দেখার সময়। কালো বাজারেও ডিসি বা ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট না পেয়ে এক শ্যালকসহ সস্ত্রীক থার্ডক্লাসেই ছবিটা দেখেতে বাধ্য হয়েছিলাম সেই সময়।

অর্কর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি অতি প্রতীক্ষিত ছবি দেখার আসন্ন প্রত্যাশায় নাকের নিচে উত্তেজনার গোপন ঘাম টলমল করছে। ছেলের মতো আমিও উত্তেজিত। তবে সেটা যত না হ্যারি পোটার দেখার জন্য তার চেয়ে বেশী এই ছবিতে অভিনয়কারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত দুই কিশোরীর কারণে। ইতোমধ্যেই ইন্টারনেটের কল্যানে জানা হয়ে গেছে শেফালী চৌধুরী আর

আফসান আজাদ নামের দুই কিশোরী প্রথম বাংলাদেশী হিসাবে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরব হয়ে হলিউডের ছবিতে পদযাত্রা শুরু করেছে।

কিছুক্ষনের মধ্যে ছবি শুরু হয়ে গেল। যদিও পুরোটা সময় আমার এবং আমার স্ত্রীর ঘাড় উপর-নীচ আর ডাইনে বায়ে করতে করতে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিভাবে যে আড়াই ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল তা বলা মুশকিল।

এই প্রথমবারের মতো হ্যারি পোটারের ছবি ব্রিটিশ কোন পরিচালকের পরিচালনায় মুক্তি পেল যার ছাপ পুরো ছবিতে দৃশ্যমাণ। হ্যারি পোটারের প্রথম দুটির পরিচালক ছিলেন আমেরিকান ক্রিস কলাম্বাস এবং তৃতীয়টির পরিচালক ছিলেন মেক্সিকার পরিচালক অ্যালফনসন কোয়ারন। ব্রিটিশ পরিচালক মাইক নিওয়েল আগের দুই পরিচালকের চেয়ে ভিন্নতরভাবে তার ছবি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন যা ”হ্যারি পোটার এন্ড গবলেট অফ ফায়ারে” পরিষ্কার। ইন্দ্রজালের জগত ছেড়ে এটি প্রায় হরর ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অসাধারণ ক্যামেরার কাজ, দর্শনীয় স্পেশাল এফেক্টের ব্যবহার আর নিপুণ সম্পাদনায় গুণে এক নিঃশ্বাসে ছবিটি দেখতে বাধ্য হবে দর্শক। ছবির মুল সুত্রপাত ঘটে হগওয়ার্ট স্কুলে ট্রাই-উইজার্ড প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে। হগওয়ার্টসহ আরো দুটি ম্যাজিক্যাল স্কুল অংশ নেয় এই প্রতিযোগিতায়। গবলেট অফ ফায়ার তিন স্কুলের তিন চ্যাম্পিয়নের নাম ঘোষনা করে। সেই সাথে রহস্যময়ভাবে গবলেট অফ ফায়ারে চৌদ্দ বছর বয়সী হ্যারির নামও ভেসে উঠে। যদিও প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী সতের বছরের নিচের কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না, যেহেতু এটি খুবই বিপদজনক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীদের ভয়ংকর ও বিপদজনক তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে হয়। যা মুলত এই ছবিটির মুল বিষয়বস্তু। ডিম ছিনিয়ে আনতে গিয়ে আগুনমুখো ড্রাগনের ধাওয়া, অন্ধকারাচছন্ন অতল জলের নীচে আটকে পড়া বন্ধুদের উদ্ধার করতে যেয়ে জলকুমারীদের ভয়ংকর আক্রমন বা ভয়াবহ দীর্ঘকায় জীবন্ত ঝোপের পেচিয়ে ধরার চেস্টা দর্শকের শীরদাড়ায় কাপুনি উঠিয়ে দিতে সক্ষম।

অন্যান্য হ্যারি পোটারের ছবির তুলনায় এই ছবিটির সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক হচেছ, নিওয়েল শুধুমাত্র ফ্যান্টাসি নিয়েই কাজ করেননি। সামাজিক বাস্তবতাকেও মুর্ত করার চেস্টা করেছেন। হ্যারি পোটার ও তার বন্ধুরা এখন আর বালক বালিকা নেই। প্রত্যেকেই পৌঁছে গেছে বয়ঃসন্ধিক্ষনে। এই জটিল সময়ের আশা, আকাংখা, ভালবাসা, আবেগ হতাশাকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নিওয়েল। চো চ্যাংকে নাচের আমন্ত্রণ জানাতে যেয়ে হ্যারির তোতলামো, ভিক্টর ক্রমের সাথে হারমাইওনির নাচ দেখে রনের হতাশার মধ্য দিয়ে বয়ঃসন্ধিকালের অসামঞ্জস্যতা ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। কিশোর কিশোরীদের নাচের আসরে ডেট খোঁজার অনভিজ্ঞ প্রচেষ্টাতেও হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস চেয়েছেন পরিচালক।

হগওয়ার্ট স্কুলের এই নাচের আসরেই মুলত হ্যারি এবং রনের ডেট হিসাবে আগমন ঘটে প্যাটিল যমজ বোনরূপী বাঙ্গালী দুই মিষ্টি কিশোরীর। হ্যারির বলনাচের সঙ্গী পার্বতী প্যাটিলের চরিত্রে অভিনয় করেছে সতের বছরের শেফালী চৌধুরী। আর তার যমজ বোন পদ্মা হয়েছে ষোল বছরের আফসান আজাদ। জন্মসুত্রে অবশ্য দুজনই ব্রিটিশ নাগরিক। শেফালীর পরিবার সিলেট থেকে বহুদিন আগে পাড়ি জমিয়েছে ইংল্যান্ডে, থাকেন বার্মিংহামে। অন্যদিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের বসবাসকারী আফসানের পরিবারের শিকড় হচেছ চট্টগ্রামে। শেফালী ও আফসান দুজনই এ লেভেলের ছাত্রী। শেফালীর বিষয় হচেছ সমাজবিজ্ঞান ও রিলিজিয়াস স্টাডিজ। পক্ষান্তরে আফসানের বিষয় হচেছ কেমিষ্ট্রি, বায়োলজী, ইংলিশ এবং মিডিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ।

প্যাটিল বোনদের খোঁজার জন্য ক্যাষ্টিং ক্রুরা ব্রাডফোর্ড এলাকার এশীয় স্কুলগুলোতে হানা দেওয়া শুরু করেছিল। যমজ বোন খুজে পাওয়া দুরুহ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তারা সমমানসিকতাসম্পন্ন দুজন দক্ষিন এশীয় কিশোরীর সন্ধান করতে থাকে। হাজার হাজার ভারতীয়, পাকিস্তানী আর বাংলাদেশী কিশোরীদের টপকে টিকে যায় শেফালী ও আফসান। আফসানের ভাষ্য অনুযায়ী সে আর তার বন্ধুরা শুধুমাত্র মজা করার জন্যই, এই প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছিল। অবশ্য ছবিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তার সিরিয়াসনেসে কোন ঘাটতি ছিল না।

মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই হ্যারি পোটার এন্ড দ্য গবলেট অফ ফায়ার বক্স অফিস চার্টে শীর্ষে অবস্থান করছে। এ পর্যন্ত সারাবিশ্বব্যাপী ছবিটি আয় করেছে চারশ মিলিওন ডলারেরও বেশী। শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ব্যাবসা করেছে দুইশ মিলিওনের উপরে যা প্রথম দুই সপ্তাহে যে কোন হ্যারি পোটার মুভির চেয়ে বেশী।

ছবি দেখে ফিরে আসার সময় পুরোটা সময়ই চোখের সামনে ভেসে ছিল শ্যামলবর্নের বাঙ্গালী দুই কিশোরীর মায়াময় মুখ। আমরা বর্তমান প্রজন্ম ভাষাগত সীমাবদ্ধতা আর রক্তের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির সুগভীর শিকড়ের কারণে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে পুরোপুরি অভিযোজিত হতে পারিনি। যার মাশুল আমরা দিচিছ প্রতি পদে পদে এ সমাজে পরাজিত হয়ে। আশার কথা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম উঠে আসছে সাড়ম্বরে, সদর্পে। শেফালী আর আফসানের মতো দৃপ্তপায়ে পশ্চিমা সমাজে দৃঢ় অবস্থান গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টায় লিপ্ত তারা। বৈরী এই সমাজে আমরা যে সাফল্য পাইনি তা করায়ত্ত্ব করুক আমাদের সন্তানেরা এই শুভকামনা করি। সফল হোক প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় প্রজন্মের সাহসী অগ্রযাত্রা।

উইন্ডজর, ক্যানাডা।
Email: farid300@gmail.com